… বিশেষত রলস্, নোজিক, রাজ (Raz) প্রমুখ সাম্প্রতিককালের উদারনৈতিক চিন্তাবিদ এই অনিবার্য দ্বন্দ্ব থেকে রেহাই পাননি।

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার সম্পর্কে মিলের ধারণা (Mill's Views on Representative Government)

উদারনীতিবাদী মিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। তাঁর রচিত *কনসিডারেশনস্ অন রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট* নামক গ্রন্থে তিনি আদর্শগত দিক থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকেই সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, যখন সার্বভৌম ক্ষমতা বা চরম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সমগ্র সমাজের ওপর ন্যস্ত থাকে, তখন আদর্শগত দিক থেকে তাকে শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলা হয়। কিন্তু **মিল** উপলব্ধি করেছিলেন যে, যেহেতু বর্তমান বৃহদায়তন সমাজে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে প্রত্যেকের অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়, সেহেতু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রই হল গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা। রুশোর মতো তিনি গণতন্ত্রকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে চাননি।

আদর্শগত দিক থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ

মিলের মতে, একটি আদর্শ শাসনব্যবস্থা সমাজের জনকল্যাণকর নীতিসমূহকে কার্যকর করে এবং মানসিক ও নৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হয়ে থাকে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করতে পারে এবং মানুষের জীবনকে উন্নত করে। এই সরকার নাগরিকদের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে এবং নৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবনের উন্নতি ঘটায়। স্বাধীন মতপ্রকাশের মাধ্যমে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। তাই **মিল** মনে করতেন যে, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রই হল ভালো শাসনব্যবস্থা। কারণ, এই সরকার জনগণকে সুখী ও উন্নত করে তুলতে পারে। তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে রাজনৈতিক সাম্যের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পদমর্যাদা নির্বিশেষে সব নাগরিকই সমান এবং জনগণের সার্বভৌমিকতাই সরকারকে বৈধতাদান করতে পারে।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র আদর্শগতভাবে উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা হলেও মিল তার ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তাই তিনি শর্তসাপেক্ষে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেছেন। এই শর্তগুলি হল—[১] জনগণ যে-সরকারকে চাইছে, সেই সরকারের প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের সচেতন হতে এবং সেই সরকারের প্রকৃতি অনুধাবন করতে তাদের আগ্রহ ও সামর্থ্য থাকতে হবে ; [২] ওই কাম্য সরকারকে নিরাপত্তা দিতে জনগণকে ইচ্ছুক ও সক্ষম হতে হবে ; এবং [৩] ওই সরকারের লক্ষ্য পূরণ তথা প্রতিজ্ঞা পালনের ক্ষেত্রে জনগণের ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকতে হবে। কেবল এই তিনটি শর্ত ছাড়াও, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একেবারেই চালু করা যাবে না, সেইসব পরিস্থিতির এক দীর্ঘ তালিকা তিনি পেশ করেছিলেন। তাঁর মতে, (ক) যে-দেশের মানুষদের মধ্যে শাসন করার ইচ্ছার তুলনায় শাসিত হওয়ার মানসিকতা প্রবল; (খ) যেখানে মানুষ সহজেই সামরিক শক্তির প্রতি আনুগত্য দেখায়; (গ) যেখানে মানুষের দাসসুলভ প্রবণতা প্রবল; (ঘ) যেখানে অধিকাংশ মানুষ রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন নয় ও কেবল নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কে অত্যন্ত

গণতন্ত্রের শর্তসমূহ

Scanned with CamScanner

সচেতন; এবং (ঙ) যেখানে মানুষ রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উদ্যোগী হয়ে অগ্রসর হয় না, সেইসব পরিস্থিতি গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়। মিল মনে করতেন যে, কতকগুলি শর্তের ভিত্তিতে যেমন প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে জনস্বার্থের পক্ষে উপযোগী এবং কল্যাণকর করে গড়ে তোলা যায়, তেমনি অযোগ্য মানুষদের দেশে যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

তত্ত্বগতভাবে মিল ছিলেন একজন বিশুদ্ধ গণতন্ত্রী। তিনি গণতন্ত্রের বিপদ ও দুর্বলতা সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। তাই ওয়েপার মিলকে দ্বিধাগ্রস্ত গণতন্ত্রী (reluctant democrat) বলে চিহ্নিত করেছেন।[৩৫] গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন নয় এমন সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতা, অযোগ্য ও অশিক্ষিতদের শাসন প্রভৃতি বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা ছিল। তাই প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা যাতে সুস্থ শাসনব্যবস্থায় পরিণত হতে পারে, সেজন্য কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কথা মিল বলেছেন। গণতন্ত্রে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রাধান্যই সুনিশ্চিত এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের গুরুত্ব অবহেলিত হয়, সেজন্য এই শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগুরু জনগণ কর্তৃক সংখ্যালঘু জনগণের নিপীড়িত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। টক্‌ভিল্ (Tocqueville)-এর মতো মিলও গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বেচ্ছাচার সম্পর্কে আতঙ্কিত ছিলেন। কারণ, এর ফলে গণতন্ত্রে সংখ্যালঘু জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই মিল বলেছেন যে, গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের যেমন শাসন করার অধিকার থাকবে, তেমনি তাদের দায়িত্ব হবে সংখ্যালঘু জনগণের বক্তব্য ধৈর্যসহকারে শ্রবণ ও অনুধাবন করা। তাঁর মতে, যথার্থ গণতন্ত্রে প্রতিটি দল ও গোষ্ঠীরই সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত।[৩৬] সুতরাং, শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদেরও যথার্থ প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

মিল কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতার মতো বিপদের সম্ভাবনার কথা ভেবে শঙ্কিতই হননি, সেই সঙ্গে অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও রাজনৈতিক সচেতনতাহীন মানুষের হাত থেকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করার কথাও চিন্তা করেছিলেন। আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন ও দৃঢ় মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই তিনি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। জ্ঞানীগুণী, শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের ওপর তাঁর অধিকতর আস্থা ছিল। তাই সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার নীতির পক্ষে মতপ্রকাশ করলেও এব্যাপারে নির্বাচকদের ওপর বৌদ্ধিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার কথা তিনি বলেছেন। তাঁর মতে, সর্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সর্বজনীন শিক্ষা প্রয়োজন।[৩৭] পড়া, লেখা ও গণিতের সাধারণ জ্ঞান অর্জন ছাড়া কোনো ব্যক্তির ভোটদানে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেকের একটিই ভোট থাকবে—এই বেহামীয় নীতি হল বিকৃত গণতান্ত্রিক নীতি। যথার্থ গণতন্ত্রে মানুষে মানুষে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও সামর্থ্যের ব্যবধানকে গুরুত্ব দেওয়ার ওপর তিনি জোর দেন। অযোগ্য ও অশিক্ষিত মানুষের হাত থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য মেধা ও সম্পত্তির নিরিখে একাধিক ভোটদানের নীতি (Weighted Vote)-কে তিনি সমর্থন করেছেন। এক্ষেত্রে মিল রাজনৈতিক সাম্যের পরিবর্তে বৌদ্ধিক অভিজাততন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। তিনি এলিট মানুষদের মেধা, বুদ্ধি ও যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন।

শিক্ষার প্রসার ও শ্রেষ্ঠত্ববাদ

সমকালীন পরিস্থিতিতে সংসদের নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক আচরণে মিল শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, এই ধরনের দুর্নীতি কেবল প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। তাঁর মতে, গোপন ভোটদান পদ্ধতি চালু থাকলে নির্বাচক দায়িত্বহীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। তাই তিনি গোপন ভোটদান পদ্ধতির বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভোট দেওয়া কেবল একটি অধিকার নয়, তা একটি ন্যাস (trust)-ও বটে। তাই অন্যান্য কর্তব্যের মতো ভোটদানের কর্তব্যও প্রকাশ্যে এবং সকলের সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে জনগণকে পালন করতে হবে।[৩৮]

প্রকাশ্য ভোটদান

মিলের উদ্দেশ্য ছিল সংসদের কাজে পবিত্রতা ও দক্ষতা রক্ষা করার জন্য প্রয়াসী হওয়া। তাই তিনি বলেছেন যে, সংসদ-সদস্যরা বিনা পারিশ্রমিকে জনপ্রতিনিধিত্ব করবেন এবং তাঁরা নিজেদের কেবল নিজ নিজ এলাকার মানুষজনের নির্বাচিত প্রতিনিধি বলে মনে না করে সমগ্র দেশের জনপ্রতিনিধি বলে মনে করবেন। তবে নির্বাচনের সময় প্রার্থীর যে-ব্যয় হয়, তা তাঁকে বহন করতে হবে না। প্রকৃত গণতন্ত্রে সংসদ নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রশাসনের কাজে নামবে না, সংসদ কেবল সবকিছুর তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা গ্রহণ করবে। প্রশাসনের ব্যাপারে শাসন বিভাগেরই চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে। মিলের মতে, লর্ড সভায় যেহেতু আইনজ্ঞ সদস্যরা থাকেন, সেহেতু বিলের খসড়া রচনার দায়িত্ব ওই সভার হাতে ন্যস্ত থাকা উচিত। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সংশোধনের ক্ষমতা থাকবে কমন্স সভার। এ ছাড়া, নারীদের ভোটাধিকারের বিপক্ষে যেসব যুক্তি খাড়া করা হত, সেগুলিকে খণ্ডন করে তিনি নারীদের ভোটাধিকারের সপক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শাসন করার জন্য নয়, যাতে তারা বিকৃতভাবে শাসিত না হয়, সেজন্য পুরুষদের মতো নারীদেরও সমান রাজনৈতিক অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়।[৩৯]

সংসদের সংস্কার

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য মিল সংগতভাবেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর মতে, কোনো দেশের শাসনব্যবস্থায় এমন কতকগুলি বিষয় থাকে, যেগুলি জাতির সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আবার, এমন কতকগুলি বিষয় থাকে, যেগুলি কেবল স্থানীয় স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উদাহরণ হিসেবে কোনো গ্রাম বা শহরের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের কথা বলা যায়। প্রত্যেক শহর বা গ্রামের নিজস্ব এমন কতকগুলি সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তা থাকে, যেগুলি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীরাই গভীরভাবে আগ্রহান্বিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোনো শহরে পানীয় জল সরবরাহ, বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ, ময়লা নিষ্কাশন ইত্যাদি সমস্যার প্রতি সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীরাই বিশেষভাবে আগ্রহী হয়। সুতরাং স্থানীয় এলাকার বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আগ্রহী অধিবাসীদের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, মিল মনে করতেন যে, কোনো দেশের সরকারি কার্যাবলি এত বিপুল যে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা তার সামান্য অংশই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। এমতাবস্থায় জাতীয় এবং আঞ্চলিক—উভয় বিষয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই উভয় বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া উচিত বলে মিল অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পুরোপুরি স্থানীয় কর্তব্যগুলি পৃথক স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করা উচিত এবং এই কর্তৃপক্ষ স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে, জাতীয় আইনসভার অধীনে নয়। তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকদের কাছে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষাগত মূল্যও কম নয়। মিলের মতে, স্থানীয় শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা কার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নাগরিক চেতনা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এরূপ চেতনা একদিকে যেমন নাগরিকদের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে তেমনি গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। তাই মিল স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলিকে 'গণতন্ত্রের বিদ্যালয়' (schools of democracy) বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা সম্পর্কে মিল যখন বলেছেন, তারপর প্রায় দেড়শো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মিলের যুক্তি যতখানি উপলব্ধি করা হচ্ছে, তা আর কখনও করা হয়নি। বর্তমানে গণতন্ত্র ও বিকেন্দ্রীকরণ—এই দুটি ধারণাকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা একেবারেই সম্ভব নয়। বরং বলা যায়, বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া গণতন্ত্র তাঁর আসল রূপটি পূর্ণতরভাবে প্রস্ফুটিত করতে পারে না। স্থানীয় প্রশাসনে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি হতে পারে। কিন্তু সেজন্য স্থানীয় অধিবাসীদের ভুল করা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। মিল যথার্থই বলেছেন যে, নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে যে-নৈতিক ও বৌদ্ধিক সুবিধা লাভ করা যায়, তার গুরুত্ব কম নয়।[৪০]

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা

যেসব পরিস্থিতিতে ও শর্তের ভিত্তিতে মিল প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করতে ও সফল করে তুলতে চেয়েছেন এবং যেসব সংস্কারের কথা বলেছেন, সেগুলিকে অনুসরণ করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। উচ্চতর গুণসম্পন্ন, মেধাবী এবং সম্পত্তিবান মানুষদের প্রাধান্যকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি এলিটবাদ বা প্রবরবাদী মনোভাবকেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর এলিটবাদী মানসিকতা ছিল তৎকালীন ইংল্যান্ডের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বুর্জোয়া মানসিকতার সঙ্গে বিশেষভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই মানসিকতাই হয়তো

Scanned with CamScanner

সাধারণ মানুষের প্রতি আস্থা রাখার ক্ষেত্রে তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সম্পর্কে মিলের বক্তব্যের গুরুত্বকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত, তিনি ছিলেন কর্তৃত্ববাদ-বিরোধী এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থক। কোনো স্বৈরাচারী শাসকের পক্ষে সমাজের কল্যাণসাধন এবং ব্যক্তির আত্মোন্নয়নের পথ সুগম করা যে সম্ভব নয়, সে বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত হল—যদি যিশুখ্রিস্টকে বাঁচাবার জন্য সিজারকে ডেকে আনা হয়, তবে সেই সিজারই সর্বপ্রথমে মহান যিশুকে হত্যা করবেন।[৪১] গণতন্ত্রকে সফল করে তোলার জন্য শিক্ষার ওপর মিল যখন গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তখন তাকে নিছক এলিটবাদ বলে উড়িয়ে দেওয়া অযৌক্তিক। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে দেখা যায় যে, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা গণতান্ত্রিক অধিকারকে হাস্যকর করে তুলেছে এবং গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করেছে। তাই শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে গণতন্ত্রের উপযোগী রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলে মিল উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সাফল্যের ভিত্তিপ্রস্তরই স্থাপন করেছেন। নারীদের ভোটাধিকার প্রদানের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে তিনি যে-পরামর্শ দিয়েছেন, তা আজকের নারীবাদী আন্দোলনের যুগে অধিকতর প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

মূল্যায়ন

Scanned with CamScanner

বেন্থাম ও উপযোগিতার নীতি (Bentham and the Principle of Utility)

উপযোগিতার নীতিকে কেন্দ্র করেই বেন্থামের হিতবাদী দর্শন গড়ে উঠেছে। **বেন্থাম** তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *ইনট্রোডাকশন টু দ্য প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ মরালস্ অ্যান্ড লেজিসলেশন (Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789)*-এর মধ্যে এই উপযোগিতার সূত্র ব্যাখ্যা করেছেন। উপযোগিতার নীতিটি তিনি গ্রহণ করেছেন হবস্, লক্, হিউম, **ডেভিড হার্টলি** (David Hartley), প্রিস্টলি, বেক্কারিয়া এবং হাচেসনের কাছ থেকে। স্পিনোজা ও হিউম দিয়েছেন উপযোগিতার প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রিস্টলি দিয়েছেন আনন্দ ও বেদনার ধারণা এবং হাচেসনের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন 'বহুজনের সর্বাধিক হিতসাধন'-এর আদর্শ। এঁদের সঙ্গে বেন্থাম যুক্ত করেছেন গাণিতিক হিসাব। এইভাবে বেন্থাম তাঁর উপযোগিতার নীতিটি গড়ে তুলেছেন।

উৎস

বেন্থাম উপযোগিতাকে একটি বস্তুর ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, একটি বস্তুর উপযোগিতা আছে বলে তখনই মনে করা হবে, যদি সেই বস্তু আনন্দ বা সুখ সুনিশ্চিত করতে পারে। অপরদিকে, যে-বস্তু দুঃখকষ্ট বা বেদনা ডেকে আনে, তাকে উপযোগিতাহীন বলে গণ্য করা হবে। বেন্থামের উপযোগিতা সূত্র অনুসারে, আমরা সেইসব বিষয় গ্রহণ করি, যেগুলি আমাদের সুখ বৃদ্ধির সহায়ক এবং সেইসব বিষয় বর্জন করি, যেগুলি দুঃখদায়ক। **বেন্থাম** তাঁর *ইনট্রোডাকশন টু দ্য প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ মরালস্ অ্যান্ড লেজিসলেশন* গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন যে, প্রকৃতি মানুষকে দুটি সার্বভৌম নিয়ন্তার অধীনে রেখেছে। এই দুটি নিয়ন্তা হল সুখ এবং দুঃখ। এরাই ঠিক করে দেয় আমাদের কী করা উচিত, এরাই নির্ধারণ করে দেয় আমরা কী করব। সুখের স্পৃহা এবং দুঃখ থেকে পরিত্রাণের প্রচেষ্টা—এই স্বাভাবিক প্রবণতার দ্বারাই মানুষের যাবতীয় আচরণ, কর্ম ও চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয়। উপযোগিতার সূত্র অনুযায়ী, আমরা সুখের পরিমাণ যথাসম্ভব বৃদ্ধি এবং দুঃখের পরিমাণ যথাসম্ভব হ্রাস করতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকি।

অর্থ

বেন্থামের উপযোগিতা তত্ত্ব হল ভোগসুখবাদী তত্ত্ব। তাঁর এই তত্ত্বে বর্ণিত সুখ কোনো উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক নৈতিক সুখ নয়, ব্যাবহারিক জীবনের পার্থিব সুখ মাত্র। এই সুখকে তিনি মানুষের বস্তুমুখী স্বার্থ ও সুবিধার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। তাঁর কাছে সুখ হল ব্যক্তিগত অনুভূতি। সুখ হল তৃপ্তি এবং দুঃখ হল কষ্ট বা যন্ত্রণা। হব্‌সের মতো **বেন্থাম**ও বলেছেন যে, আত্মসুখের সন্ধানেই মানুষ ছোটে। বেন্থামের ব্যক্তিমানুষ অপরের সুখে নয়, নিজের সুখেই তৃপ্ত। প্লেটোর ত্যাগবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। ত্যাগবাদী নীতিকে বেন্থাম নিতান্ত অসার বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, আত্মসুখ বর্জনের নীতি কখনোই কোনো মানুষের পক্ষে সামঞ্জস্য বজায় রেখে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। নির্বিকারবাদীদের মতো সহানুভূতি ও বৈরাগ্যের নীতিতে বেন্থামের আস্থা ছিল না। বস্তুত, উপযোগিতা-সূত্রের স্বাভাবিকতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে বেন্থামের বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, এই সূত্রের বিরোধী সব নীতিকেই তিনি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন।

ভোগসুখবাদী

বেন্থামের উপযোগিতার নীতি গুণগত দিকের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পরিমাণগত দিককেই প্রাধান্য দেয়। সুখ বলতে তিনি সুখের পরিমাণকে বোঝাতে চেয়েছেন। যেহেতু নিছক পার্থিব সুখ লাভই হল মানুষের লক্ষ্য, সেহেতু বেন্থামের কাছে সুখের পরিমাণগত দিকটিই ছিল একমাত্র বিচার্য বিষয়। তাঁর মতে, একধরনের সুখ অন্য সুখের থেকে পরিমাণগত দিক থেকে বেশি কি না, সেটাই বিচার করা প্রয়োজন। সুখের গুণগত দিকের বিচার করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। বেন্থামের কাছে আনন্দের পরিমাণগত দিক সমান থাকলে, 'পুশ-পিন' খেলার আনন্দের সঙ্গে কবিতাপাঠের আনন্দের কোনো গুণগত পার্থক্য নেই।[১৩] বেন্থামের উপযোগিতা নীতি অনুযায়ী, সুখের সর্বোচ্চ পরিমাণ বৃদ্ধিই হল মানুষের জীবনের লক্ষ্য। তাই মানুষ চায় সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখের বৃদ্ধি ঘটাতে এবং দুঃখের পরিমাণ যথাসম্ভব লঘু করতে। এরই ওপর নির্ভর করে মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতা।

পরিমাণগত দিক

বেন্থামের উপযোগিতা নীতিতে সুখ ও দুঃখের পরিমাণই যেহেতু বিচার্য বিষয়, তাই পরিমাপযোগ্যতা

Scanned with CamScanner

হল এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। **বেন্থামের** মতে, সুখ ও দুঃখ পরিমাপ করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে তিনি 'সুখকলন' তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তিনি মনে করতেন যে, গাণিতিক নিয়মে সুখ ও দুঃখের পরিমাণ ও পরিণামকে পরিমাপ ও তুলনা করা যায়। এই পরিমাপ ও তুলনা করতে হয় কতকগুলি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। সেজন্য সুখের তীব্রতা কতখানি, স্থায়িত্ব কতখানি ও নিশ্চয়তা কতখানি, তা দেখা দরকার। তা ছাড়া, দেখতে হবে সুখ আমার হাতের কাছে না, দূরে রয়েছে। এই সুখ কতটা পবিত্র অর্থাৎ দুঃখের অনুভূতি থেকে কতটা মুক্ত, কতটা উর্বর। অন্যভাবে বলা যায়, একটি সুখানুভূতির একই ধরনের আরও অনেক সুখানুভূতির জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা ও ব্যাপ্তি কতখানি রয়েছে অর্থাৎ, বিবেচিত সুখ কত সংখ্যক মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। সুখকলন তত্ত্বের ভিত্তিতে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে একদিকে সুখের পরিমাণ এবং অন্যদিকে দুঃখের পরিমাণের মধ্যে তুলনা ও পরিমাপ করতে হবে। এই হিসাবনিকাশের পর যদি দেখা যায় যে, সুখের পরিমাণ দুঃখের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি, তাহলে সেক্ষেত্রে মানুষের কাজ বা আচরণ ভালো ও নীতিসম্মত বলে বিবেচিত হবে। আর যদি দুঃখের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে মানুষের আচরণ বা কাজ অনৈতিক ও মন্দ বলে প্রতিপন্ন হবে।

সুখকলন

এইভাবে আঙ্কিক হিসাবের ভিত্তিতে বেন্থাম সুখ ও দুঃখের মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে এই প্রক্রিয়া সঠিক বলে মনে হলেও একে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক আনন্দ ও বেদনার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা বাস্তবে অসম্ভব। সুখ ও দুঃখ কোনো বিষয়গত একক নয়, যাকে আঙ্কিক হিসাবের ভিত্তিতে পরিমাপ করা সম্ভব। যেহেতু এগুলি হল অনুভূতির বিষয়, সেহেতু গাণিতিক নিয়মে কোনো সূত্র নির্ধারণ করে সেগুলিকে পরিমাপ করা অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। **প্লামেনাজ** বেন্থামের সুখকলন তত্ত্বকে শুধু বাস্তব দিক থেকেই অসম্ভব বলেননি, সেই সঙ্গে তত্ত্বের দিক থেকেও অসম্ভব বলে মনে করতেন।[১৪]

বেন্থামের তত্ত্ব অনুযায়ী, যেহেতু সুখের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়, সেহেতু সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখলাভই হল ব্যক্তির সর্বোচ্চ ও অন্তিম লক্ষ্য। তাঁর দৃষ্টিতে চূড়ান্ত ফল বা পরিণতিই হল একমাত্র বিচার্য বিষয়, উৎস নয়। চরম সুখই মানুষের পরম নৈতিক আদর্শ হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত সুখ উৎপাদনে সমর্থ যে-কোনো বিষয়ই ভালো বা সুন্দর বলে গণ্য হতে পারে। বেন্থামের এই উপযোগিতার নীতিটি ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আবরণে আবৃত। ব্যক্তির স্বার্থই এখানে শেষ কথা। তবে ব্যক্তিজীবনে ক্রিয়াশীল উপযোগিতা সূত্রকে সমাজজীবনেও প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। সমাজ সম্পর্কে প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌লের জৈব তত্ত্বকে তিনি বর্জন করেছেন। সমাজকে তিনি দেখেছেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর দৃষ্টিতে সমাজ হল ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র। সুতরাং ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বেন্থাম সমাজের হিতসাধনের নীতি উপস্থাপন করেছেন। সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখলাভ যেমন ব্যক্তির অন্তিম লক্ষ্য, তেমনি সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ হিতসাধন (greatest good of the greatest number)-ই হল সমাজের অন্তিম লক্ষ্য। এক্ষেত্রে বেন্থাম গ্রিক দর্শনের অহংসর্বস্ব ভোগসুখবাদকে পরিহার করেছেন এবং তাঁর হিতবাদকে সর্বজনীন ও সদিচ্ছাপূর্ণ করে তুলেছেন।

সমাজের হিতসাধন

ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সামাজিক স্বার্থের যে বিরোধ দেখা দিতে পারে, সে বিষয়ে বেন্থাম সতর্ক ছিলেন। তাই উভয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনের ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। **বেন্থামের** মতে, মানুষের মধ্যেই আত্মসুখ অর্জনের প্রবণতার সঙ্গে পরার্থ-সুখ লাভেরও প্রবণতা থাকে। মানুষের আচরণে আবেগের পরিতৃপ্তির ইচ্ছা থাকলেও যুক্তিবোধও কম শক্তিশালী নয়। নিজে সুখী হতে গেলে অপরের সুখও চাইতে হয়। অপরের সুখে সুখী হওয়াই হল পরার্থ সুখ। এতে সকলেরই সুখ বেশি হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়। কিন্তু **বেন্থাম** উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিস্বার্থভিত্তিক আত্মসুখের সন্ধানে ধাবিত হয়। এর ফলে সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে বিরোধ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তাঁর মতে, এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন উপযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার। **বেন্থাম** মনে করতেন যে, হিতবাদী নৈতিক আদর্শ চরিতার্থ করতে সমাজ এবং আইনের সংস্কারসাধন প্রয়োজন।

ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের সমন্বয়

বেন্থামের উপযোগিতা নীতি সমালোচকদের দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। নৈতিক তাত্ত্বিক ও আদর্শবাদীরা এই তত্ত্বকে একটি অতি স্থূল বৈষয়িক জীবনদর্শন বলে পরিহার করেছেন। তখনই মনুষ্যত্বের সার্থক বিকাশ ঘটে, যখন মানুষ তার কাজকর্ম ও আচরণের উৎস বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের নৈতিক মূল্যায়ন করে এবং এর প্রেক্ষিতে সৎ ও ভালো লক্ষ্যকে বেছে নেয়। কিন্তু বেন্থামের তত্ত্বে কাজের উৎস বিচারের প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নেওয়া হয়নি। তাঁর মতে, অন্তিম ফল বা পরিণতিই হল একমাত্র বিচার্য বিষয়। চরম সুখই হল মানুষের পরম নৈতিক আদর্শ। **বেন্থাম** প্রাকৃতিক অধিকার, সার্বভৌমিকতা এবং অন্যান্য অধিবিদ্যক চরম ধারণার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক মূল্যায়নের বিষয়টিকেও পরিহার করেছেন। তিনি যুক্তি ও বিচারবিবেচনাকে গুরুত্বই দেননি। কিন্তু আমরা স্বভাবত যা করি এবং যুক্তি ও বিচারবিবেচনা প্রয়োগ করে যা করা উচিত বলে মনে করি—এই দুইয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু বেন্থাম এই পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। তাঁর মতে, সুখের সন্ধান করাই হল মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। আবার, তিনি সুখ অর্জনের চেষ্টা করাকেই মানুষের কর্তব্য বলে চিহ্নিত করেছেন।

মূল্যায়ন

বেন্থামের উপযোগিতা নীতির দুর্বলতম দিক হল এই যে, তিনি ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন।[১৫] ব্যক্তিগত সুবিধার হিসাবনিকাশ বিচক্ষণতার পরিচায়ক হতে পারে, কিন্তু তা সামাজিক নৈতিকতার মানদণ্ড হতে পারে না। তিনি মানুষের আচার-আচরণের যে-লক্ষ্যের কথা বলেছেন, তা মানুষের নৈতিকতা নয়, তা হল এক ধরনের স্থূল সুবিধাবাদ। এরূপ সুবিধাবাদ কখনোই সামাজিক স্বার্থের ভিত্তি হতে পারে না। আত্মসুখী মানুষ পরহিতবাদের মধ্যে সুখী হতে চায়—এ কথা অযৌক্তিক। সমাজের সার্থক চরিত্র তার সমগ্রতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিজীবনের যোগফল দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তা ছাড়া, ক্রমবর্ধমান জটিল সামাজিক প্রক্রিয়ায় কেবল ব্যক্তিজীবনের প্রেক্ষিতে সমাজ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বেন্থাম মানুষের মনস্তত্ত্বের যে-ছবিটি একেঁছেন, তা যথেষ্ট নয়। ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের গভীরে প্রবেশ করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। সুখ ও দুঃখ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল ভাসাভাসা। এর ফলে আমরা উপযোগিতা সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। তবে রাষ্ট্রতত্ত্বের জগতে উপযোগিতা নীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তিনি উপযোগিতা সূত্র দিয়ে মানুষের আচরণের যে-বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবানুগ ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন, তার গুরুত্ব কম নয়। বস্তুত, ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রচিন্তার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে বেন্থাম তাঁর উপযোগিতা নীতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রচিন্তার অগ্রগতির পথরোধকারী বাধাগুলিকে অনেকাংশে দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

রাষ্ট্র ও আইন-সংক্রান্ত ধারণা (Idea of the State and Law)

বেন্থামের রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা উপযোগিতা নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ—আধুনিক যুগের রাষ্ট্রচিন্তার দুটি উল্লেখযোগ্য ধারণার মধ্যে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।[১৬] বস্তুত, তাঁর *এ ফ্র্যাগমেন্ট অন গভর্নমেন্ট, ডিফেন্স অ ইয়ুজিয়রি (Defence of Usury)* এবং *ম্যানুয়াল অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি (Manual of Politica Economy)* নামক গ্রন্থগুলির মধ্যে বেন্থাম একদিকে যেমন অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রী নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করেছেন, অপরদিকে তেমনি উপযোগিতার সূত্র যাতে যথাযথভা পালিত হয় সেজন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। **বেন্থামের** মতে রাষ্ট্র হল একটি আইনগত সংস্থা, যার নৈতিক ভিত্তি হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। কিছু সংখ্য ব্যক্তিকে নিয়ে সংগঠিত এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হল নাগরিকদের সুখ বা আনন্দ বর্ধন ও সুরক্ষিত করা।[১৭] প্লে এবং অ্যারিস্টট্‌লের মতো তিনি মনে করতেন না যে, রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য হল মানুষের জীবনকে সৎ সুন্দর করে তোলা। তাঁর মতে, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সর্বাধিক সুখ সুনিশ্চিত করাই হল রা অন্যতম কর্তব্য। ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উপযোগিতার নৈতিক সূত্র যথাযথভাবে প্র করতে সক্ষম, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি বলেছেন যে, ব্যক্তিজীব

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

Scanned with CamScanner